ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে .....

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

(গত ৩১ জানুয়ারী, মঙ্গলবার, রাতের প্রথম প্রহরে, সিডনীর ম্যারিকভিল সাবার্বের ইলোয়ারা রোড এবং এডিসন রোডের সংযোগস্থলে এক মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় ইউনিভার্সিটি অব নিউসাউথ ওয়েলসে এর Geology বিভাগের তৃতীয়বর্ষের বাংলাদেশী ছাত্র আবু মোহাম্মদ জাহিদ রেজা খান (রণন) মারা যায় । তারই স্মরণে এই স্মৃতিদর্পণ।)

‘প্রবাসে দৈবের বশে, জীব তারা যদি খসে এ দেহ আকাশ হতে ...’

একত্রিশে জানুয়ারী, ২০০৬ এর মধ্য রাত। আমার ছেলে শেরিফ শুয়ে পড়েছে। গিন্নী ঢাকায় বেড়াতে গেছেন; একটা ফোন করে তার খোঁজ-খবর নিয়ে আমিও ঘুমুতে যাবো - বাকী রাতের জন্য এটাই আমার প্ল্যান ।

এমন সময় ঢাকা থেকে আলী আহসান খানের টেলিফোন। ওর ছেলে রকি এইমাত্র টেলিফোনে জানিয়েছে যে ওর রুমমেট রণন (জাহিদ রেজা খান) এক মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনার শিকার হয়েছে এবং খুব সম্ভবতঃ মারা গেছে। পুলিশ সরাসরি কিছু বলছে না; তবে আকারে ইংগিতে বুঝিয়ে দিয়েছে যে রণন আর নেই। আমি যেন অবশ্যই ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিই এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে সঠিক সংবাদটা জানাই। ঘটনাটা সত্যি হলে রণনের বাবা-মাকে তো জানাতে হবে। আমাকে টেলিফোন করার একটাই কারণ - আমি এবং আমার স্ত্রী রকি আর রণনের স্থানীয় অভিভাবক - ফুপা আর ফুপী! ইউনিভার্সিটি অব নিউসাউথ ওয়েলসের এম কম (অর্থনীতি) ক্লাশের ছাত্র রকি এবং জিওলজী বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র রণন হিলসডেলের ব্রিটানিয়া ক্রিসেন্টে একটা এপার্টমেন্ট নিয়ে থাকতো। দুই রুমমেট অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল, কাজেই রকির দেয়া এ খবর মিথ্যে হবার কথা নয়। তবু সাথে সাথেই মোবাইল ফোনে রকির সাথে যোগাযোগ করলাম ।

হ্যাঁ, পুলিশ জানিয়েছে দূর্ঘটনার শিকার গাড়ীটির তিন জন আরোহীর মধ্যে দু’জন - বেণু এবং রাসেল - বেঁচে আছে এবং তাদেরকে নিউ টাউনের প্রিন্স আলফ্রেড হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বেণু সামান্য আঘাত পেয়েছে, তবে রাসেলের অবস্থা আশংকাজনক । তৃতীয়জন - অর্থাৎ গাড়ীর চালকের তাৎক্ষনিক মৃত্যু হয়েছে। পোস্টমর্টেম এর জন্য তার লাশ পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে । গাড়ীটা বেণুর, তবে চালাচ্ছিল রণন। দুইয়ে দুইয়ে চারের মতোই হিসাব অত্যন্ত পরিষ্কার; গাড়ীর তৃতীয় আরোহী এবং চালক রণন বেঁচে নেই। ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে দ্বিধার কোন অবকাশ নেই, যদিও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। আমার বুক ভেঙ্গে কান্না আসছিল। এইতো মাত্র তিন দিন আগে আটাশ তারিখ বিকেলে রণনের সাথে ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসে আমার দেখা হয়েছিল। কি আশ্চর্য, আজ মাত্র তিন দিন পরেই ও চিরদিনের জন্য নেই হয়ে গেলো! কি যে করবো বুঝতে পারছিলাম না। কাঁচা ঘুম থেকে আমার ছেলেকে জাগালাম; বয়সে রণনের চেয়ে

সে বেশ বড় হলেও দু'জনের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল। টেলিফোন করে আরো জাগালাম আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু ডঃ ফজলুর রহমান কে। আমরা কি দুর্ঘটনাস্থলে যাব? রকিকে ফোন করতেই ও নিষেধ করলো - 'ফুপা, পুলিশ তো লাশ নিয়ে গেছে; আজ দেখতে দেবে না। কালকে দেহ শনাক্তকরণের জন্য আমাকে Coroner এর অফিসে যেতে বলেছে' বললো ও। রুম মেট হিসেবে রকিই এখন পুলিশের কাছে রণনের নিকটতম জন। ও এবং রণনের অন্য সব বন্ধুরা একসাথে আছে এবং যা যা করণীয় তার সব ই ওরা মিলে মিশে করছে। 'কি ভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটলো?' রকি বললো ব্যাপারটা এখনো ধোঁয়াটে, পরে জানাবে।

এই সব প্রাথমিক তথ্য জানানোর জন্য রকির বাবা আলী আহসান খানকে ফোন করতে যাচ্ছি, ঠিক এমন সময় আমার নিজের টেলিফোন ই বেজে উঠলো । 'ভাই, আমি রণনের মা বলছি। আলী আহসান খান ভাই আমাকে এটা কি শোনালেন? আমার রণনের কি হয়েছে? ও বেঁচে আছে তো? ও বাঁচবে তো?' বলতে বলতে উনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন । এর পর রণনের বোন ফাল্গুনীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো 'আংকল, ভাইয়া কি মরে গেছে?' কি কঠিন সব প্রশ্ন ! একজন মাকে আমি কেমন করে বলি যে আপনার একমাত্র পুত্র আর বেঁচে নেই ? কোন মুখে একমাত্র ভাইয়ের প্রিয়তম বোনটিকে আমি বলি 'ঠিকই শুনেছিস মা, তোর আদরের ভাইটি আর কখনো তোর কাছে ফিরে আসবেনা; বলবেনা এই দেখ ফাল্গুনী, সিডনী থেকে তোর জন্য কি এনেছি।' সব সংবাদ কি সবাইকে দেয়া যায়? যায় কি সব সত্যকে সহজ ভাবে উচ্চারণ করা? ফাল্গুনীর পর ওর বাবা আবিদ রেজা খান ফোন ধরে আমাকে সেই একই প্রশ্ন করলেন - একটু অন্যভাবে, 'কোন আশা আছে কি ভাই?' কি করে তাকে বলি যে তার একমাত্র সন্তান এখন জাগতিক সব আশা নিরাশার উর্ধে চলে গেছে। আমি শুধু তাকে বলতে পারলাম 'দুর্ঘটনার পর রণনের পালস পাওয়া যায়নি'। 'রণন মারা গেছে' নিজ মুখে এ সংবাদ তার বাবা মাকে আমি দিতে পারিনি । তাকে বলেছি 'আলী আহসান খান আমার স্ত্রী নাসিম আর রকির মা হেলেন কে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার বাসায় যাচ্ছেন। তারা পুরো ঘটনা - অন্ততঃ যতটুকু এ পর্যন্ত জানা গেছে - আপনাদেরকে জানাবেন।'

আমি তখন অবাক হয়ে ভাবছি যে পরিষ্কার ভাবে খবরটা জানানোর আগেই রণনের বাবা-মা খবরটা পেলেন কি ভাবে। পরে শুনেছি যে রকির ফোন পাওয়ার পরপরই আলী আহসান খান আবেদ ভাই আর রীতা ভাবীকে জানায় যে একটা বিশেষ প্রয়োজনে সে তাদের সঙ্গে তক্ষুনি দেখা করতে চায়। আবেদ ভাইয়ের পরিবার নাকি তখন কোন বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিলেন। আলী আহসান খানের এই দেখা করার তাড়া রণনের মা সুলতানা খুরশীদ জাহান রীতার মনকে সন্দিহান করে তোলে। ওনারা সঙ্গে সঙ্গেই বাসায় ফিরে আসেন আমার কাছে খবরটা জানতে চেয়ে ফোন করেন। সন্তানের বিপদ-আপদের খবর কেমন করে যেন মায়ের মন আগেই টের পেয়ে যায়।

মধ্য রাত থেকে সকাল - এই সারাটা সময় প্রায় বিরতিহীন ভাবেই আমার টেলিফোন বেজে চললো। সব কলই ঢাকা থেকে। 'প্রফেসর রাযযাক বলছেন? আমি ভাই রণনের কাকা বলছি, আচ্ছা ভাই এটা কেমন করে হলো একটু জানাবেন ...'; 'ভাই এতো রাতে ফোন করছি বলে কিছু মনে করবেন না, আমি রণনদের প্রতিবেশী ...'; 'রাযযাক সাহেব

বলছেন? আমি ভাই ব্রিগেডিয়ার ..., রণনের বাবার বন্ধু; একটু দয়া করে জানাবেন কেমন করে এ দূর্ঘটনাটা ঘটলো ... '। এমনি আরো অজস্র কল; সবাই জানতে চান কেমন করে মারা গেল তাদের অতি আদরের রণন !

সকাল পাঁচটায় সে রাতের শেষ কলটি রিসিভ করে শুতে গেলাম। ঘুম কি আর আসে? হঠাৎ মনে হলো আড়াই বছর আগেও এই ছেলেটি ছিল আমার কাছে নিতান্তই অপরিচিত বাংলাদেশ থেকে সিডনীতে পড়তে আসা অনেক ছেলেদেরই একজন । গত আড়াই বছরে সেই ছেলেটিই আমার এত কাছের একজন মানুষ হয়ে গেল যে আজ রাতের এই শেষ প্রহরে ওর কথা মনে করে আমি কাঁদছি। আমার মনে হচ্ছে কি যেন আমার একটা ছিল যা হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল।

সব রাতেরই ভোর হয়, এ কালরাতেরও হল। । এলো পহেলা ফেব্রুয়ারীর সকাল। আজ অনেক কাজ - লাশ শনাক্ত করা, ডেথ সার্টিফিকেট জোগার করা, লাশ ঢাকায় পাঠানোর জন্য মৃতদেহ সৎকারকারী কোন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা ও এ ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া। দুপুরের মধ্যেই রুমমেট এবং ঘনিষ্টতম বন্ধু হিসেবে রকি ওর মৃতদেহ শনাক্ত করে এবং ওদের বন্ধু, বিশেষ করে রিফাত, শান্তা, শাহেদ ও নাজিমের সহযোগীতায় সব প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে। আন্ডারটেকার জানায় যে ভাগ্য ভাল হলে শুক্র অথবা শনিবারের মধ্যে লাশ ঢাকায় পৌঁছে যাবে। ঢাকায় এ কথা জানানোর পর টেলিফোনে আরেক দফা অনুরোধ এবং অনুযোগের বন্যা। 'শুনুন প্রফেসর সাহেব, আমার বন্ধু অমুক সিডনীর একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার; ওর সাথে যোগাযোগ করে পুলিশকে প্রভাবিত করে লাশটা একটু আগে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন ...'; 'আরে ভাই লাশ পাঠাতে এত দেরী হবে কেন? দেখুন না কোনভাবে কিছু করে লাশটা একটু আগে পাঠানো যায় কিনা ...।' তাদের তাড়া দেবার কারণটা বুঝতে পারি, কিন্তু তাদেরকে এটা বোঝাতে পারি না যে আমরাও চাইছি এবং আপ্রাণ চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রণনের মরদেহ তার প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছে যাক। এক দেশ থেকে আর এক দেশে মৃতদেহ পাঠানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় সরকারী নিয়মকানুন বা ফর্মালিটিজ আছে এবং সেগুলোকে ইচ্ছে করলেই এগিয়ে আনা বা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কেন যেন বাংলাদেশের লোকেরা এটা বুঝতে চান না যে নির্ধারিত নিয়মকানুন পালনের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের প্রভাবিত করার যে জঘন্য কালচারটা বাংলাদেশে প্রচলিত সেটা অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত নয়। এ দেশের কর্মচারীরা কর্মনিষ্ঠ এবং নিয়মনীতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তবে তারা মানবিক গুণাবলীসম্মৃদ্ধ। যথাসময়ে তারা করণীয় সব কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করে দেয়; বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের মতো তারা মানুষকে ঠেকিয়ে, ঘুষ খাওয়ার জন্য কাজ আটকে দেয়না। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে ঢাকা থেকে এ ধরণের অনুরোধকারী দু'একজনের সাথে আমি একটু রেগেই গিয়েছিলাম - তাদেরকে রূঢ়ভাবে মনে করিয়ে দিতে হয়েছে যে এ দেশটা বাংলাদেশ নয়।

পোস্টমর্টেম এবং আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হবার পর ২রা ফেব্রুয়ারী লাশ ঢাকায় পাঠানোর জন্য আন্ডারটেকার এর কাছে দেয়া হলো । তারা জানালো যে পরদিন অর্থাৎ ৩রা ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে শেষ বারের মতো

দেখার জন্য এমবাম করা রণনের মরদেহ সিডনীর সেফটন সাবার্বে তাদের নিজস্ব হল ঘরে রাখা হবে । তার এক দিন পর অর্থাৎ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার রাতে থাই এয়ারয়েজের ফ্লাইটে রণনের মরদেহ ঢাকার পথে শেষবারের মতো সিডনীর কিংসফোর্ড স্মিথ বিমানবন্দর ত্যাগ করবে এবং ৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার দুপুরে ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছুবে। ঢাকায় এ খবর জানানোর পর আরেক দফা কান্নার রোল শুনতে পেলাম। আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করার জন্য ফেব্রুয়ারীর এই দিনটিতেই রণনের ঢাকা যাবার কথা ছিল; তবে এভাবে কফিনে শুয়ে নয়।

'আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায় ....'

৩রা ফেব্রুয়ারী বিকেল তিনটে । সিডনীর সেফটন সাবার্বে আন্ডারটেকারের ঠিকানায় পৌঁছে দেখি আমাদের আগেই অনেকে সেখানে জড়ো হয়েছে রণনকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে । ওর বাংগালী বন্ধুরা ও পরিচিত জন ছাড়াও ওখানে এসেছে ওর সহপাঠী ও সহকর্মী শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গ অনেক বন্ধু, তাদের বাবা-মা-ভাই-বোনেরা। সাড়ে তিনটের সময় কফিনের ঢাকনা খুলে দেয়া হল। ঐ তো রণন শুয়ে আছে নিরুদ্বিগ্ন,শান্ত, সমাহিত। মুখে তার সেই অতি পরিচিত স্নিগ্ধ, স্মিত হাসি। ও যেন এক দীর্ঘ ক্লান্ত দিনের শেষে কিছুক্ষনের জন্য শুয়েছে; এখুনি জেগে উঠবে । একটু ধাতস্থ হবার পর এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম। ওর ঘনিষ্ট বন্ধুরা - যারা গত ক'দিন ধরে একটা ঘোরের মধ্যে থেকে করণীয় সব কিছু করে গেছে - হঠাৎ করেই যেন বুঝতে পারলো রণনের এই ঘুম আর কোনদিন ভাঙ্গবে না; এ দেখাই রণনের সাথে তাদের শেষ দেখা । প্রিয় বন্ধুর মরদেহ আকড়ে ধরে তাদের সে কি কান্না। ছেলেরা কাঁদছে, কাঁদছে মেয়েরা, কাঁদছে ছোট, বড় সবাই। কেউ সরবে, কেউ বা নীরবে। ডঃ ফজলুর রহমানের ছোট মেয়ে তানিয়া - যাকে রণন ওর ছোটবোন ফাল্গুনীর আসনে বসিয়েছিল -মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর থেকেই ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। লাশ দেখার পর সে কান্না বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার রূপ নিল। রণন কি শুনতে পাচ্ছিল তার বন্ধু-স্বজনদের এই কান্না? ও কি অনুভব করতে পারছিল বন্ধুদের কত কাছের মানুষ ছিল ও? বন্ধুরা ওকে কত ভাকবাসতো?

বিকেল আনুমানিক পাঁচটার সময় কফিনের ডালা বন্ধ করার সময় হলো । আমরা সবাই মিলে পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে রণনের আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করে দোয়া করে ওকে শেষ বিদায় জানালাম । রণনের ঘনিষ্টতম বন্ধু, রুমমেট, এ্যাশ-রণ মানিকজোরের এ্যাশ (রকি)- যে গত চারদিন ধরে আহার নিদ্রা বিশ্রাম সব ভুলে অনেকটা রোবোটের মত ভাবলেশহীন ভাবে সব দায়িত্ব সামলাচ্ছিল - কফিন বন্ধ করার ঠিক আগের মূহূর্তটিতে হঠাৎ করেই যেন ভেঙ্গে পড়লো। আপন তর্জনীতে চুমুর পরশ লাগিয়ে সে তর্জনী দিয়ে তার অতি প্রিয় 'রণ' এর ললাটে সে যেন একে দিল কফিনের ঢাকনা বন্ধ করার অনুমতি। আমরা সবাই যার যার ঠিকানায় চলে এলাম ।

পরদিন পবিত্র জুমা'বার। পারতপক্ষে রণন জুমা'র নামাজ বাদ দিত না। নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাম ক্রাকনেল ভবনে, যেখানে সে সচরাচর জুমা'র নামাজ আদায় করতো, সেখানে এবং আর্নক্লিফ মসজিদে তার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত জুমার নামাজের পর এক সংক্ষিপ্ত স্মরণ সভায় তার বন্ধু-বান্ধব,

শুভানুধ্যায়ী, বিভাগীয় শিক্ষক, ও ছাত্র ছাত্রদের উপস্থিতিতে তার প্রতি শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানানো হলো। রাতের থাই এয়ারলাইনস এর ব্যাংকক গামী ফ্লাইটে তার মরদেহ ঢাকার পথে রওয়ানা হয়ে ৫ই ফেব্রুয়ারী দুপুরে ঢাকায় তার বাবা-মা এর কাছে পৌঁছে। সিডনী সময় বিকেল আনুমানিক পাঁচটায় আমাকে ঢাকা থেকে লাশের প্রাপ্তিসংবাদ জানানো হয়। সেদিনই শেষ বিকেলের ম্লান আলোকে রণনের বাবা ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আবিদ রেজা খান তাকে শেষ গোসল করান। এরপর বারিধারা ডিওএচএস মসজিদে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। আর সেদিনই বনানী কবরস্থানে তার দাদার কবরের পাশে রণনকে সমাহিত করা হয়।

‘বুক দিল যে, ভুক দিল সে, দুঃখ দিতে ভুললো না,
মৃত্যু দিল লেলিয়ে পাছে পাছে ...।’

কি হয়েছিল রণনের? ও কেমন করে মারা গেলো?
এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, তবে অনুমান করা যেতে পারে। একত্রিশে জানুয়ারীর রাতে ম্যারিকভিল সাবার্বের ৯৯ নিউইঙ্গটন রোডের বাসায় রণন ও তার বন্ধুরা মিলে একটা পার্টির আয়োজন করেছিল। এ বাসাটি ওদের সব বন্ধুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল; অনেক উইক এন্ডেই ওরা এখানে জড়ো হয়ে আডডা দিত এবং খাওয়া দাওয়া করতো। সেদিন কাজের শেষে সন্ধ্যে বেলায় রণন পার্টিতে যোগ দিতে আসে । ও খুব ভাল রাঁধতে পারতো। ম্যারিনেড করার মশলা কম থাকার কারণে আনুমানিক আটটার দিকে বেণু এবং রাসেলকে সঙ্গে নিয়ে ও মশলা কেনার জন্য বাসার কাছেই একটি বাঙ্গালী দোকানে যায়। কিন্তু দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরও ফিরে না আসায় বন্ধুরা চিন্তিত হয়ে পরে এবং হাসপাতাল এবং পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে। প্রায় মধ্যরাতে ওরা জানতে পারে যে ওদের বাসা থেকে মাত্র দু’শ মিটার দূরে এডিসন রোড এবং ইলোয়ারা রোডের সংযোগস্থলে ওদের ছয় সিলিন্ডারের টয়োটা ক্রেসিডা দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে গাড়ীটা প্রচন্ড গতিতে প্রায় একশ ফুট উড়ে এসে একটা ল্যাম্পপোষ্টে আঘাত হানে ও ল্যম্পপোষ্টটিকে দু’ভাগে ভেঙ্গে ফেলে। এরপরও না থেমে গাড়িটি আরো প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট এগিয়ে গিয়ে আরেকটি থেমে থাকা ট্রাককে ধাক্কা মেরে আরো কিছুদুর এগিয়ে যায়, একটি বাড়ির দেয়ালে আঘাত করে, এবং একটু পিছিয়ে এসে থেমে যায়। খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এবং প্যারমেডিকের দল এসে আহত বেণু ও রাসেলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। গাড়ী কেটে রণনকে বের করা হয়, কিন্তু ও আর বেঁচে ছিলনা। ওকে তাই করোনারের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় পোস্টমর্টেম করার জন্য।

ওর সব বন্ধুদের মতে রণন অত্যন্ত দক্ষ চালক ছিল। তাহলে এমন দূর্ঘটনা ঘটলো কেমন করে? দূর্ঘটনার সময় ওকি নেশাগ্রস্ত ছিল? অবশ্যই নয়; পোস্টমর্টেমে পুলিশ গাড়ীর চালকের নেশাসক্তির কোন প্রমাণ পায়নি। তাছাড়া রণন ব্যক্তিগতভাবে বেশ ধার্মিক ছিল; ওর ক্ষেত্রে এ ধরণের সন্দেহ নিতান্তই অমূলক। তাহলে কি হতে পারে? ইলোয়ারা রোড বেশ উঁচুনীচু এবং এর উপরে একাধিক গতি নিয়ন্ত্রক হাম্প রয়েছে। এটা এমন রাস্তা নয় যেখানে অতি দ্রুত গতিতে গাড়ী চালানো সম্ভব। কিন্তু পুলিশের দেয়া রিপোর্ট অনুযায়ী

গাড়িটি নির্ধারিত গতি সীমার প্রায় ষাট কিলোমিটার ওপরে চলছিল এবং রাস্তায় পাওয়া আলামত অনুযায়ী প্রায় একুশ মিটার পথ উড়ে গিয়েছিল! এটা ঘটলো কেমন করে? অনেকেরই ধারণা এর সম্ভাব্য কারণ দু'টো। প্রথম কারণটি সম্ভবতঃ গাড়ীর যান্ত্রিক গোলযোগ। গাড়ীটি নাকি ক'দিন আগেই কারো কাছ থেকে কেনা হয়েছিল, এবং সেদিন বা তার আগের দিনই গাড়ীটির সার্ভিসিং করা হয়েছিল । রণনের এক বন্ধু - যে গাড়ীটি একবার চালিয়েছে - বলছিল যে গাড়ীটির স্টিয়ারীং হুইলটি নাকি যেমন হওয়া উচিৎ ঠিক তেমন ছিল না। কে জানে হয়তো বা গাড়ীর একসিলারেটর ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল আর এ সব কারণেই চালক গাড়ীর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। দ্বিতীয় কারণটিও উড়িয়ে দেওয়া যায়না। সম্ভবতঃ কোন কারণে হঠাৎ করে গাড়ী ব্রেক করার প্রয়োজন হয়েছিল আর এ সময় ব্রেক না করে ভুলে চালক একসিলারেটর চেপেছিল। আবার এমন হতে পারে যে গাড়ীটির একসিলারেটরের প্যাডেল দেবে গিয়েছিল; যার ফলে চালক আর এর গতি নিয়ন্ত্রন করতে পারেনি। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে গাড়ীটি ইলোয়ারা রোডে ঢুকেই ঐ রোডের এক বাসার গ্যারেজ থেকে বের হতে যাওয়া একটা গাড়ী দেখতে পায় । ওটাকে বাঁচাতে পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ীটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। দুর্ঘটনার সত্যিকারের কারণ যাই হোক না কেন, রূঢ় সত্যি হচ্ছে এই যে রণন আর ফিরে আসবে না। ওর পরিচিত নশ্বর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অনন্তলোকের যে পথ পরিক্রমায় ও চলে গেছে, সেখান থেকে কোনদিন কেউ ফেরেনি; কেউ ফেরেনা। ওর এই অনন্তপথ পরিক্রমা শেষে আল্লাহ ওকে শান্তি দিন এই আমাদের কামনা।

'আমি চির তরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে ....'

আমার সাথে রণনের সম্পর্ক কি? আমি ওর কে? ওকে আমি কেমন করে জানি?
রণনের সাথে আমার কোন নিকট কিংবা দূরসম্পর্কের ছিঁটেফোটা আত্মীয়তাও নেই; কিন্তু তবুও ও আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং কাছের মানুষ। কেমন করে ও কাছের মানুষ হলো সেটা বলি। আমার বড় শ্যালকের অতি ঘনিষ্ট বাল্যবন্ধু আলী আহসান খানের একমাত্র ছেলে রকি সিডনীতে পড়াশুনা করতে আসার পর থেকেই আমি ও আমার স্ত্রী ওর স্থানীয় অভিভাবক। বাংলাদেশের যে সব ছেলেমেয়েরা বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে তাদের বাবা-মায়েদের অনেকেই চান যে সেই শহরে/দেশে এমন একজন কেউ থাকুক যিনি প্রয়োজনে তাদের প্রবাসী ছেলে-মেয়েদের দেখভাল করতে পারেন। কেমন করে আলী আহসান খানের সাথে রণনের বাবা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার আবেদ রেজা খানের পরিচয় হয় সেটা আমার জানা নেই। রণনও তখন সিডনীতে পড়ছে এবং অন্য অনেকের মতো তার বাবা-মাও চাইছিলেন যে সিডনীতে ওর এক জন স্থানীয় অভিভাবক থাকুক। আলী আহসান খান রণনের বাবাকে আমার সাথে যোগাযোগ করার কথা বলে। আমার স্ত্রী নাসিম তখন ঢাকায় । রণনের বাবা-মা এসে ওর সাথে দেখা করে অনুরোধ করেন আমরা যেন ওদের ছেলেটিকেও প্রয়োজনে রকির মত এক আধটু দেখভাল করি। নাসিম চলে আসার পর রণনের বাবা আবিদ রেজা খান আমাকে একবার ফোন করেও একই অনুরোধ করেন। সম্পর্কের সেটাই সূচনা।

আবিদ রেজা খানের টেলিফোন পাবার দু'চারদিন পরের কথা। আমার অফিসে একটি অপরিচিত, সুদর্শন ছেলে এলো। ছেলেটি দেখতে অত্যন্ত স্মার্ট, কিন্তু একটু ব্যতিক্রমি । তার অত্যন্ত আঁটোসাটো পোষাক ফেটে যেন পেশী বেরিয়ে আসবে। স্টিলের বালা পরা তার হাতে; আর সে একটা চাবির রিং ঘোরাচ্ছে। এ ধরণের ছেলেরা সাধারণতঃ সালাম দেয় না, গুড মর্নিং কিংবা গুড আফটারনুন জাতীয় সম্বোধন করে; কিন্তু এই ছেলেটি সালাম দিল। আমার কাছে কেন এসেছে জিজ্ঞেস করতেই সে বললো-
'স্যার, আমি রণন; আমার আব্বা আমাকে আপনার সাথে দেখা করতে বলেছে।'
আমি অবশ্য নাম শুনেই ওর পরিচয় পেয়ে গেছি, তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্য প্রশ্ন করি -
'তোমার আব্বা কে?'
'ব্রিগেডিয়ার আবিদ রেজা খান।'
'কেন দেখা করতে বলেছেন? কোন বিশেষ কারণ আছে কি?'
'তা তো জানি না, আব্বা বলেছেন সব কিছুতে যেন আপনার সাথে পরামর্শ করি।'
'এখন কি কোন সমস্যা হয়েছে?'
'না, আপনার সাথে পরিচিত হতে এসেছি।'
'বেশ করেছো; একদিন বরং বাসায় এসো' বলে ওকে বাসার ঠিকানা দিলাম।
একটু পর সে বললো 'আসি স্যার, আবার পরে আসবো; আস সালামু আলায়কুম'।
'শোন, এর পর যখন আমার এখানে আসবে, এ পোষাকে আসবে না; তুমি এখানে পড়তে এসেছো, বডি বিলডিং করতে নয়, মনে থাকবে।' আমি বললাম।
'থাকবে স্যার', ছেলেটির ঘাবড়ে যাওয়া জবাব।
'আর শোন স্যার বলবে না, অন্য কিছু ডাকবে' আমি আবার বললাম।
'আচ্ছা স্যার' বলে বেচারা দৌড়ে পালালো।
সেই আমার সাথে রণনের প্রথম পরিচয়। তারপর ও প্রায়ই আসত আমার কাছে। কোন কোর্স নেয়া কেরিয়ারের জন্য ভাল হবে, ডাবল মেজর নেবে কিনা ইত্যাদি নানাধরণের প্রশ্ন নিয়ে ও আমার কাছে আসতো। বেশ ভয়ে ভয়েই কথা বলতো ও; শত হলেও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই, একটু আড়ষ্টতা তো থাকবেই।

আস্তে আস্তে ও আমার কাছে বেশ সহজ হয়ে গেলো। এর মধ্যে ও বেশ কয়েকবার রকির সঙ্গে আমাদের বাসায় এসেছে এবং খুব সহজেই আমার স্ত্রী ও ছেলের আপনজনে পরিণত হয়ে গেছে। প্রথমে যাকে দেখে মনে হয়েছিল ছেলেটা যেন কেমন, পরে দেখা গেল আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ও একটি অতি সহজ সরল মনের চমৎকার এবং ভালোবাসার মতো ছেলে। একসময় আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী রকি, রণন আর শোভন নামে আর একটি ছেলে একসংগে থাকতে শুরু করে। শোভন পরে আলাদা বাসায় চলে গেলে রকি আর রণন এক সাথে থাকতে শুরু করে।

সম্ভবতঃ ২০০৫এর শুরুতে রণন আমাদের পরিবারের আরো কাছে চলে আসে। ঢাকায় দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে সিডনী ফিরে এসে দুই মানিক জোড় (এ্যাশ এন্ড রন) আর পছন্দসই বাসা খুঁজে পেল না। আমার স্ত্রী পরামর্শ দিল ওরা যেন আমাদের সাথেই থাকে। সে সময় ওরা কিছুদিন আমাদের বাসায় ছিল। আমার ছেলে শেরিফ ছিল তাদের রোল মডেল। শেরিফ ক্যান্সার প্রতিরোধে ফান্ডরেইজিং এর জন্য মাথা ন্যড়া করে ফেললো; তাই

ওদের মাথা ন্যড়া করেফেললো; শেরিফ হঠাৎ করে দাড়ি রাখা শুরু করলে দেখা গেল রকি আর রণন ও দাড়ি রাখতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে আমাদের মনে হতো আমাদের যেন তিনটি ছেলে।

হিলসডেল এর যে বাসাটিতে ওরা থাকতো সেটা আমাদের বাসার খুব কাছে ছিল। প্রায় প্রতি শনিবার অথবা রবিবার সন্ধ্যেটা রকি, রণন আর শোভন আমাদের সাথে কাটাতো। মাঝে মাঝে ওরা আবার ওদের বন্ধুদেরও সঙ্গে নিয়ে আসতো। আমার স্ত্রী অতি আদরে ওদের প্রিয় খাবার - আলুভর্তা, ভুনা মাংস, ঘন ডাল, কাবাব, পাটিসাপটা পিঠা এবং আরো অনেক কিছু - ওদেরকে রান্না করে খাওয়াতে ভালবাসতেন। হয়তো এই সামান্য আতিথেয়তার মাধ্যমে বাবা-মা থেকে দূরে বসবাসকারী এই প্রবাসী ছেলেগুলো বাংলাদেশে ফেলে আসা তাদের নিজেদের পরিবারকে আবার খুঁজে পেতো। একবার রণনের বেশ অসুখ হলো। শুনে আমার স্ত্রী খাবার দাবার রান্না করে দিয়ে এলেন। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রায় প্রতিদিনই ওর খোঁজ নিতে চেষ্টা করেছি। এমনি করে কখন যে রণন আমদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিল বুঝিনি। আবিদ রেজা ভাই, তার স্ত্রী রীতা ভাবী মাঝে মাঝেই ফোন করতেন, বলতেন ওদের ছেলেটা আস্তে আস্তে আমাদের ছেলে হয়ে যাচ্ছে; রণন তার ফুপা, ফুপি সম্বন্ধে এই বলেছে, ওই বলেছে এমনি ধারা অনেক কথা ...।

আজ রণনকে ঘিরে কত কথাই না মনে পরছে। ঈদের সময় আমাদের বাসা থেকে আমি ও শেরীফ, রকি এবং রণনকে ওদের বাসা থেকে তুলে নামাজের জামাতে নিয়ে যেতাম। গত ঈদুল আজহার সময় এক মজার কান্ড হল। রাতে রণন আমাকে ফোন করে বললো ‘ফুপা, আমাকে আর এ্যাশকে কিন্তু নামাজে নিয়ে যাবেন।’ ঘুম থেকে উঠে টেলিফোন করে রকিকে জাগিয়ে রেডী হতে তাগিদ দিলাম; বললাম ঠিক পৌনে সাতটায় তুলে নেব। সময়মতো ওদের ঠিকানায় পৌঁছে দেখি একা রকি দাঁড়িয়ে, রণন নেই। ‘রণনের কি হোল?’ রকি বললো শত চেষ্টা করেও নাকি ওকে জাগানো যায় নাই। ... ... বছর ঘুরে আবার ঈদ আসবে, হয়তো আমি, আমার ছেলে শেরীফ, রকি আমরা সবাই আবার আগের মতোই জামাত ধরার জন্য খুব ভোরে জেগে উঠবো। আমাদের রণনের জীবনে আর কখনো আসবেনা কোন ঈদ, ওকে আর জাগতে হবে না। ও আর জাগবে না। কক্ষনো না, কোনদিন ও না।